Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 113 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 113 - 118
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আশাপূর্ণা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্প : প্রতিবাদী নারী ভাবনার উন্মেষ

রিয়া সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : rsaha7597@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Ashapurna Devi, Twentieth Century, Rebellious women, Subjugation, Compromises, Patriarchy, Emergence, Middleclass.

Abstract
All have to make compromises in life to live in a society. But in the case of women they face more challenges. In reality the position and opportunities to men and women are not equal. In a patriarchal society women are often kept as ignorant, homebound and weak. If we look back into the situation of hundred or two hundred years ago, we can find that women were bound to be in ignorance then. In the beginning of twentieth century there were still many obstacles in woman education so they had limited scope for work life. In this bleak era Ashapurna Devi introduced herself as a writer. The feminist writings prior to Ashapurna forecasted only women's subjugation and surrender. Through they often talked about protest against the subjugation, but in very liminal way. We only find a strong voice for emancipation of women, achieving a solid ground and free air for them, in the writings of Ashapurna. Inspite of being a woman writer of that bleak era Ashapurna envisioned the lives of Bengali middl class women with a progressive mindset. Women have their own saga of life - their family centered lifestyle - ups and downs of life - their own happiness. Ashapurna constitutes her writings portraying these personal emotions of women. In her writings the subjugation of women is presented at first and then the emancipation of women is indicated. In her writings the Women characters are able to protest against all the insult, contempt and hatred. In mythology even when the heaven was threatened by the demons, gods were unable to defeat demon Mahishasur, they took help from furious mother figure called Devi Durga. women come forward to protest against evils of society also. They sang the song of revolution.In this essay some such rebellious women characters constituted by Ashapurna Devi in her writings, are presented.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 113 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

সাহিত্য ব্যাপারটি দেশ-কাল-সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। সাহিত্য যেহেতু জীবনকে ছাড়া ভাবা যায় না তাই তাতে সূক্ষ্মতিসূক্ষ ভাবে হলেও সমাজ জীবনের প্রতিফলন ঘটে থাকে। কথা সাহিত্যিক হিসেবে আশাপূর্ণা দেবীর ক্ষেত্রেও কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে যখন বাইরের পৃথিবী বিধ্বস্ত, মানুষের পুরাতন পরিবারের ধারণা, মানুষে মানুষে সম্পর্কের এক নতুন মাত্রা বিন্যস্ত হচ্ছে তখনও পর্যন্ত চারদেয়ালের মধ্যেকার জীবনটাই মেয়েদের পৃথিবী। আর এই কাজটিই নিপুণভাবে করলেন লেখিকা তাঁর রচনায়। অন্তঃপুরের সেই মর্মকথা অধিকার করে নিল পাঠকের হৃদয়।

বিশ শতকের প্রথমে জন্ম নিয়ে যে সমাজটাকে লেখিকা দেখেছিলেন শৈশব ও বাল্যকালে, তার মধ্যে নারী পুরুষের অবস্থানগত বৈষম্য তাঁকে সবথেকে বেশি পীড়া দিয়েছে। ছোটবেলা থেকেই এই বোধ আশাপূর্ণা দেবীকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। তিনি সব সময় চাইতেন পুরুষের সঙ্গে নারীর মনুষ্যত্বের সমান অধিকার। কিন্তু তিনি সর্বত্রই দেখেছেন পুরুষের প্রবল প্রতাপ। মেয়েদের নতজানু, দুঃখময়, নিরুপায় জীবন তাঁর মনকে দারুন অস্থির করত। তিনি জানিয়েছেন–

> “ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রশ্নমুখর মন তখনকার প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে মানুষে মানুষে ব্যবস্থার এমন পার্থক্য কেন?... বেশী পীড়িত করেছে মেয়েদের অবস্থা। কেন তাদের সকল বিষয়ে এই অধিকারহীনতা? কেন তাদের জীবন কাটে অবরোধের অন্ধকারে?”[১]

আমাদের দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে প্রায় প্রতিটি সংসারের অন্দরমহলের অলিন্দে অলিন্দে যে চিত্র ফুটে ওঠে, সেই কথাগুলিকেই সহৃদয়তার সঙ্গে ছোটগল্পের আকারে আমাদের সামনে প্রস্ফুটিত করেছেন লেখিকা। তাঁর নিজের ভাষায়–

> “আমার লেখার উপজীব্য কেবলমাত্র মানুষ।... মধ্যবিত্ত ঘরোয়া মানুষ, যে আমার একান্ত চেনা জানা। আমি আমার জানা জগতের বাইরে কখনও হাত বাড়াতে যাই না।”[২]

লেখিকা তার লেখায় মেয়েদের বঞ্চনার ও বেদনার ওপর আলো ফেলে তাদের জীবনের কেন্দ্রে টেনে এনেছেন। দাঁড় করিয়েছেন প্রতিবাদীর ভূমিকায়। তাইতো রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও যেন বলতে চেয়েছেন-

> “নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেহ নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা।”[৩]

কবি বা সাহিত্যিক কোন ভুঁইফোর মানুষ নন এবং তাঁর সৃষ্টিও শুধুমাত্র কল্পনার বিলাস নয়। তিনি যে পরিবার, পরিবেশে, সমাজে বেড়ে ওঠেন তা যেমন তাঁকে গঠন করে, তেমনি গড়ে তোলে তাঁর সৃষ্টিকে, জীবনবোধকে, শিল্পীমনকে। আশাপূর্ণা দেবীর ক্ষেত্রেও সেটি হয়েছে, তাইতো প্রদীপ জ্বালবার আগে সলতে পাকানোর মতো সূচনায় আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন আলোচনা জরুরী। সময়টা ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ৮ ই জানুয়ারী উত্তর কলকাতার পটলডাঙার মামার বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে বিদ্যায়তনের বাঁধা পথে শিক্ষার সুযোগ না থাকলেও, অতি অল্প বয়সেই তাঁর সামনে খুলে গিয়েছিল এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার জগত, তার মূলে ছিল তাঁর মা সরলাসুন্দরীর নিবিড় সাহিত্যপ্রীতি। এ প্রসঙ্গে লেখিকা নিজেই জানিয়েছেন –

> “আমার মায়ের ছিল ভীষণ সাহিত্যপ্রীতি। যার এক দিকে সমস্ত সংসার আর একদিকে বই পড়া। তাই বাড়িতে অনেক বই আসত। ...আর আমাদেরও স্কুলের বালাই নেই। সেই সব বইগুলো আমরা তিন বোনে নির্বিচারে পড়ে ফেলতাম অতি বাল্য থেকেই। পড়তে পড়তে লেখার সাধ হল।”[৪]

আশাপূর্ণা দেবীর সৃজনী প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল মাত্র তেরো বছর বয়সে, কবিতা লেখার মধ্যে দিয়ে। পত্রিকার নাম ‘শিশুসাথী’ (১৩৩৯)। কবিতার নাম ‘বাইরের ডাক’। পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তীর অনুরোধে পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প ‘পাশাপাশি’। ‘শিশুসাথী’ পত্রিকার সঙ্গে অন্যান্য পত্রিকাগুলি থেকেও গল্প পাঠানোর আমন্ত্রণ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 113 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আসতে থাকল। এভাবে একদিন সত্যিকারের লেখিকা হয়ে উঠলেন তিনি। আশাপূর্ণা দেবী চমকহীন, উত্তেজনা বর্জিত সাধারণ মানুষের গল্প বলেই কথাসাহিত্যের প্রথম সারিতে জায়গা করে নিয়েছিলেন। 'পত্নী ও প্রেয়সী' (১৩৪৩) তাঁর রচিত প্রথম ছোটগল্প এবং তাঁর ট্রিলজি উপন্যাস – 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৪), 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৭), 'বকুলকথা' (১৯৭৪) নারী জাগরনের উজ্জ্বলদীপ্ত উদাহরণ। এভাবে ধীরে ধীরে শুরু হয় তাঁর লেখালেখি। ১৩৪৪ থেকে তিনি নিয়মিতভাবে ছোটগল্প লেখার দিকে এগোতে থাকেন। এরকম ভাবে সহস্রাধিক গল্পের মধ্যে দিয়ে আমৃত্যু সাহিত্যের আঙিনায় বলিষ্ঠ দৃপ্ত পদচারণা করে গেছেন আশাপূর্ণা দেবী। তারই প্রভাব দেখতে পাব আলোচ্য প্রবন্ধের গল্পগুলিতে, কিভাবে নারীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে।

'তাসের ঘর' গল্পটির মধ্য দিয়ে আশাপূর্ণা দেবী দেখিয়েছেন আত্মসম্মানের জন্য ব্যক্তিত্বময়ী নারীরা ঘর ও বর দুই ছাড়তে পারে। গল্পটির আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত এক দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটানো নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। সেরকমই এক নারী মমতা এতবড় পৃথিবীতে শুধু নিজের জন্য এক টুকরো আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে, তার সাধের সংসার জলাঞ্জলি দিয়ে।

মমতার মামাতো ভাই নিখিলেশ বোমার মামলার আসামী, কয়েক ঘন্টার জন্য দিদির ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তারই ছেড়ে যাওয়া পোশাকের জন্য মমতার চরিত্রে কালি লেপন করা হয়। আর এই কাজটি করা হয় বোনের সন্তান প্রসবকালে মমতা কয়েক ঘণ্টার জন্য সেখানে গেলে, এই সময়টুকুর মধ্যে। আঠারো বছর ঘর করার পরও একটি মাত্র কারণে এত কাছ থেকে দেখা মানুষটিকে দুশ্চরিত্রা বলতে যাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হয় না এবং সবচেয়ে বড় বিস্ময় বিশ্বাস করতে যাদের কোন যুক্তিবোধের প্রয়োজন হয় না, তাদেরই বিশ্বাস করতে আজ মমতা নিজেই নারাজ। প্রচন্ড ক্ষোভের সঙ্গে মমতা বলে–

> "আঠারো বছর ঘর করার পর মমতা সম্বন্ধে যাহাদের একথা বিশ্বাস করিতে বাধে নাই, ওটুকু তাদের কাছে খুব বেশি কি?"[৫]

নারী বলেই তার অন্যায় কি এবং কতটা তার কোন যথাযোগ্য বিচার হল না; মমতার এত দিনের সংসারের কল্যাণে নিজের আত্মবলিদান— সবকিছু সংসারে জা বিজলী ছাড়া প্রতিটি মানুষ এক লহোমায় ভুলে গেল।

সম্পূর্ণ জীবনের নির্ভরতা যার ওপরে সেই স্বামীও যদি দীর্ঘদিনের সম্পর্কেও অবিশ্বাসের দেওয়াল দাঁড় করায়, তাহলে কোনো আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন নারীর পক্ষে যে সত্যিই ঘর করা সম্ভব নয়, এখানে মমতাই তার একমাত্র প্রমাণ। তাই স্বামীর সামাজিক সম্মান, ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ, তাদের বিবাহাদী সম্পর্কে আর বিন্দুমাত্র ভাবতে রাজী নয় –

> "এ সংসারের উপর আমার আর কোন দায় নেই।"[৬]

অবিশ্বাসের ধাক্কা একটা মানুষকে কঠোর বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে নিজের চেতনা ও ব্যক্তিসত্তাকে জাগ্রত করে দিল। সেই জোরেই হয়তো বলতে পেরেছে, -

> "এত বড় পৃথিবীটাই একটা মেয়ে মানুষের ঠাঁই হয় কিনা সেটাই একবার দেখব ঠিক করেছি।"[৭]

আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীতে যে বিদ্রোহিণীরা মূর্ত হয়ে উঠেছিল মমতা তাদের মধ্যে একজন। যে নারী অসহায়ত্ব পরিত্যাগ করে বিশ্বসংসারে নিজেকে নিয়ে একাকী পথ চলার সাহস রাখে।

'ইস্পাতের পাত' গল্পেও পাই 'সুখী' নামে অন্য এক প্রতিবাদী নারী চরিত্র, যে নিজের আত্মরক্ষার জন্য বা আত্মসম্মানের জন্য হাতে তুলে নেয় ছোরা। এই গল্পে বেচুলালের স্ত্রী সুখী সুন্দরী, 'চোখে পড়ার মতো মেয়ে'। লাইনে দাঁড়িয়ে জল নিতে আসা অসংখ্য রমণীর মধ্যে সুখীর ওপর বস্তির সামনে তিনতলা বাড়িতে বাস করা এক বাবুর নজর পড়ে। অজানা থাকায় সেই ভদ্রলোক বেচুলালকেই বলে সুখী কে পাইয়ে দেওয়ার জন্য। এই নোংরা ইঙ্গিতে প্রথমে স্বামীর ভেতরে একটা আক্রোশ হিস্ হস্, করে উঠলেও পরমুহূর্তেই তা যেন উল্টোদিকে মোড় নেয়। বেচুলালের মনে হল -

> "কী মুখ্যু, আমি কি মুখ্যু! ঘরে ধানের গোলা থাকতে আমি পেটে খিল মেরে পড়ে আছি! ছি! ছি!"[৮]

আর এই মানসিকতার বলি হতে হয় সুখীকে।

কিন্তু সুখী চিরাচরিত নিয়মে বাঁধা একটি নারী, সে স্বামী ছাড়া অপর পুরুষের কথা ভাবতে পারে না। অসহায় সুখী বেচুলালের পায়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে বলে -

> "আমি তোমার বে করা পরিবার না?"[৯]

বিয়ে করা পরিবার বলেই সুখী এখানে অসহায়। নারীর ওপর যেহেতু পুরুষের অধিকার তাই বেচুলাল সুখীকে হুকুম মানতে বাধ্য করে, এমনকি স্ত্রীকে অন্যপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী করাটাকেও পাপ বলে মনে করে না। বেচুলালের মনোবাসনা বুঝতে সুখীর অসুবিধা হয়না, তাই–

> "ওসব তোমার ছলের কথা, রূপসী পরিবারকে দিয়ে রোজকার করাতে ইচ্ছে তাই বল।"[১০]

সুখী নিজের সতীত্বকে রক্ষা করতে বিভিন্ন যুক্তি দেখালেও বেচুলাল সবই অগ্রাহ্য করত, উপরন্ত অসহায় সুখীকে ছোরা দেখিয়ে নরম শরীরে ছোরা গিঁথে দেবার হিংস্র একটা ভঙ্গি করত। শেষ পর্যন্ত সে এই বোঝাস্বরূপ সংসার থেকে মুক্তি পাবার জন্য স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে -

> "বেশ তোমার যা ইচ্ছে।"[১১]

এই ভাবে ক্রমশ সুখী স্বামীর আওতার বাইরে চলে যায়। সেটার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটল যেদিন সত্যিকারের 'ইস্পাতের পাত' দেখাবার সাহস সুখী পেল। বাবুর সঙ্গে গাড়িতে চড়ে হাওয়া খেতে যাবার দিন সুখী বাবুদের নিকট বেচুলালের আসল পরিচয় জানায় যে সে তার 'অগ্নিসাক্ষীর স্বামী'। বাবুরা এতদিন যাকে এজেন্ট বলে জানত সেই বেচুলালের সত্য সবার সামনে প্রকাশ হওয়ায় অপমানিত বোধ করে সুখীর স্বামী। এরপরেই সে সুখী কে হেস্তনেস্ত করতে তার উপার্জনের সমস্ত টাকা চায়, না দিতে চায়লে হাতে ছুরি নিয়ে 'এটা ভুলে গেছিস বুঝি' বলে ভয় দেখায়। নারীরা যে লাঞ্ছিত, অপমানিত হতে হতে একসময় সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে শিখে যায়; তারই উজ্জ্বল প্রমাণ এই সুখী, সে নির্ভয়ে বলে ওঠে -

> "ভুলব কেন? ও জিনিস কি ভোলা যায়, স্মরণে আছে। বরং পাছে ভুলে যাই তাই ওর একটা যমজ ভাইকে গড়িয়ে রেখেছি যে-"[১২]

সুখী আক্ষরিক অর্থে ঘর ও বর না ছাড়লেও স্বামীর অন্যায় অবিচারের বিপক্ষে বিরুদ্ধাচারণ করে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

'অবিনশ্বর' গল্পে পাই পদ্মা নামের একটি নারী চরিত্র। যে জঙ্গলে মানবরূপী জংলীদের সঙ্গে থেকে জানোয়ার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই বন্য মানুষদের ঘৃণ্য জীবন থেকে বেরিয়ে এসে তার মুখে ফুটে ওঠে প্রতিবাদের ভাষা। তার বিবেক ছিল অবিনশ্বর, তাইতো শেষ মুহূর্তেও লোভী মানুষেরা তার প্রাণের সঞ্চারকে পরিবর্তন করতে পারেনি। সেরকমই একজন নারীর জীবনের কাহিনী এই গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়।

সাবওভারসীয়ার হরিপদ দাস, জরীপবাবু ও মুকুন্দ বিশ্বাস এরা এই জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামের কর্মী। সাহেবের অনুপস্থিতিতে এরাই জঙ্গলের কাজকর্ম সামলায়। এ রকম সময় পদ্মাকে মুকুন্দ বিশ্বাস এনে কাজে লাগায়। পদ্মার বাবা-মা বন্যায় মারা গেছে। গল্পে এই পদ্মার বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা এভাবে -

> "মাজা-ঘষা স্বাস্থ্যসম্পন্ন গঠন, গ্রাম্য চেহারার উপর বিকৃত আধুনিক সজ্জার পালিশ লাগাবার ব্যর্থ চেষ্টা। মুখে চোখে একটা দুঃসাহসের ছাপ।"[১৩]

জঙ্গলে আসা নতুন সাহেবদের আদিমতার প্রলোভনে ফেলে, তাদের দুর্বলতাকে আয়ত্ত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা করে মুকুন্দ বিশ্বাসের মতো ঘৃণ্য লোকেরা। এই রকমই এক অল্প বয়স্ক সাহেব জঙ্গলে আসে। কিন্তু এই সাহেব

একটু অন্যরকম, যার ফলে তাদের কার্যকলাপের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে যায়। এই নতুন সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলা মুকুন্দ বিশ্বাসের কথায়, তাদের স্বভাব ধরা পড়ে এবং বোঝা যায় জঙ্গলে ওরা কি জাল বিস্তার করেছে-

> "মুকুন্দ বিশ্বাস অনেক অভিজ্ঞতার মুচকি হাসি হাসে - সংসার সমাজের বাইরে এই জঙ্গলে এসে অনেক উঁচু নাকই খ্যাঁদা হতে দেখলাম দাদা! কলকাঠি তো আমাদের হাতে!"[১৪]

ওভারসীয়ার ও জরীপবাবু কথায় এই সাহেবের ঘরে রাতের অন্ধকারে আদিমতার পসরা সাজিয়ে হাজির হয় পদ্মা, যেমন অন্যান্য সাহেবদের বেলাতেও হয়েছিল। কিন্তু অন্যদের মতো এই সাহেবকে উপহার সাজিয়ে দিতে পারেনি, বিনিময়ে নিজেকে দেখবার একটা প্রতিবিম্ব পেয়েছে। এই সাহেব কাজ না করিয়ে টাকা দিয়েছে এবং সরাসরি প্রশ্ন করেছে -

> "তোমাকে পাঠিয়েছে কে?"[১৫]

সাহেবের হাতে কাঁটাওয়ালা চাবুক দেখে পদ্মা ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে সব বলে দিয়েছে।

> "এভাবে খাটতে তোমার লজ্জা করে না?"[১৬]

- সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে চেতনা ফিরে পায় পদ্মা। এরপর সাহেবের সঙ্গে যখন সেই তাঁবুর দরজা অবধি যায়, তখন সে যেন নিজেকে চিনে নিতে নিতে এগিয়ে যেতে থাকে। এবার পদ্মা হেরে গেছে, আর যখন সে ফিরে যায় সেই দুটি সরীসৃপ স্বরূপ মানুষের কাছে, তখন সে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ মনের এক মানবী। তাইতো তারা তাকে এক ফোটা ছোড়া সাহেবের কাছে হেরে গিয়ে ফিরে যাবার কথা বললে, তখন সে দপ করে জ্বলে ওঠে -

> "মানুষ তো কখনও দেখনি হরিপদ দা, দেখেছ খালি জানোয়ার!"[১৭]

হাজার অভাবে থাকলেও একজন মানুষ যেমন তার আদর্শকে বলি দিতে পারে না, মনের সুদৃঢ় ভাব দৃঢ়ই থাকে, তেমনি তেজীভাব নিয়ে পদ্মা কথাগুলো বলে বেরিয়ে যেতে গেলে, মুকুন্দ তার হাত চেপে ধরলে পদ্মার মুখে আবার প্রতিবাদী ভাষা ফুটে ওঠে -

> "ছুঁয়ো না বলছি মুকুন্দদা, ভালো হবে না। ভালো হবে না! একেবারে 'ভাল্লো' হবে না! ...খবরদার মুকুন্দ দা, ছোটলেকমি করো না। তোমাদের আমি ঘেন্না করি বুঝলে? কুকুর শেয়ালের মতো ঘেন্না করি!"[১৮]

এই রাতচরা মেয়ে পদ্মা আর কোন কিছুকেই ভয় পায় না, জগতের সব বাঁধা ঠেলে, সব অশুভকে দলিয়ে মারিয়ে একাই যেন যেতে পারে সাধারণ মানুষের মধ্যে। যে মুকুন্দের আশ্রিত ছিল এক সময়, মুকুন্দ যাকে ইচ্ছে মতো নাচিয়ে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করে নিয়েছে, সেই মুকুন্দকে আর ভয় পায় না পদ্মা। সততা, নির্ভীকতা, আদর্শ ও বিশুদ্ধ নারীত্ববোধের সমন্বয়ে পদ্মা আজ এক সচেতন, সজীব মানুষ। আশাপূর্ণা দেবীর এই গল্পে পদ্মা নারী চরিত্রটি প্রতিবাদী নারীসত্ত্বার এক সার্থক রূপায়ণ।

সুতরাং উপরে আলোচিত গল্পগুলিতে দেখতে পাই আশাপূর্ণা দেবী নারীদের এক অন্য দৃষ্টিকোন থেকে এঁকেছেন। যেখানে প্রতিটি নারী অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, নিজের মনের সুপ্ত বাসনাকে প্রকাশ করতে এবং দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে। এই ঘুরে দাঁড়ানো হয়ে উঠেছে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

Reference:

১. দেবী, আশাপূর্ণা, 'আমার সাহিত্যচিন্তা', 'আর এক আশাপূর্ণা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা পুস্তকমেলা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭

২. দেবী, আশাপূর্ণা, 'খেলা থেকে লেখা', 'আর এক আশাপূর্ণা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 113 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পুস্তকমেলা, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সবলা’, ‘মহুয়া কাব্যগ্রন্থ’, রবীন্দ্র রচনাবলী অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪
৪. দেবী, আশাপূর্ণা, ‘আমার ছেলেবেলা’, ‘আর এক আশাপূর্ণা’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা পুস্তকমেলা, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪
৫. দেবী, আশাপূর্ণা, ‘তাসের ঘর’, গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২২
৬. তদেব পৃ. ১২২
৭. তদেব পৃ. ১২৩
৮. দেবী, আশাপূর্ণা, ‘ইস্পাতের পাত’, আশাপূর্ণা দেবীর রচনা সম্ভার প্রথম খণ্ড, জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭৩
৯. তদেব পৃ. ২৭২
১০. তদেব পৃ. ২৭২
১১. তদেব পৃ. ২৭৬
১২. তদেব পৃ. ২৭৬
১৩. দেবী, আশাপূর্ণা, ‘পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প’, নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ৪২
১৪. তদেব পৃ. ৩৯
১৫. তদেব পৃ. ৪২
১৬. তদেব পৃ. ৪৩
১৭. তদেব পৃ. ৪৩
১৮. তদেব পৃ. ৪৪

Bibliography:

মুখোপাধ্যায়, অরুণ, কুমার, ‘কালের পুত্তলিকা’, ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮২।
দেবী, আশাপূর্ণা, ‘আর এক আশাপূর্ণা’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা পুস্তকমেলা, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
দেবী, আশাপূর্ণা, ‘পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প’, নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৬।
দেবী, আশাপূর্ণা, ‘আশাপূর্ণা দেবীর রচনা সম্ভার প্রথম খণ্ড’, জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।
ভট্টাচার্য, তপোধীর, ‘আশাপূর্ণা : নারী পরিসর’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০০।

সহায়ক পত্রপত্রিকা :

‘কোরক’ সাহিত্য পত্রিকা, আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, কলকাতা বইমেলা, ১৪১৫।